অদ্বৈত মল্লবর্মণ

নিতাই বসু

গ্রন্থতীর্থ
৬৫/৩এ, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা — ৭০০ ০৭৩

॥ এক ॥

১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের ১ জানুয়ারি বর্তমান বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের উপকণ্ঠে তিতাস নদীর ধারে গোকর্ণঘাট গ্রামে অদ্বৈত মল্লবর্মণের জন্ম হয়েছিল। তাঁর বাবার নাম ছিল অধরচন্দ্র মল্লবর্মণ। তিনি মালোপাড়ায় বাস করতেন। অধরচন্দ্র ছিলেন হতদরিদ্র। কুমিল্লার মল্ল বা মালো সম্প্রদায়ের মানুষেরা ছিলেন মৎস্যজীবী। ত্রিপুরা-কুমিল্লা অঞ্চলে কৈবর্ত-সমাজে প্রধান চারটি বর্গের অন্যতম মালো বা মল্লবর্মণেরা বর্ণবাদী হিন্দু-সমাজে ব্রাত্যজন বলেই গণ্য হতেন। তথাকথিত ভদ্রলোকেরা মালোপাড়াকে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে 'গাবরদের পাড়া' বলে উল্লেখ করতেন। 'গাবর' শব্দটি সম্ভবত 'গাবুর' (মজুর) থেকে এসেছে। শ্রমবিচ্ছিন্ন 'ভদ্র' মানুষদের শ্রমজীবী মালোদের শ্রমের প্রতি ব্যঙ্গ ও অবজ্ঞা থেকেই এই নামের সৃষ্টি। বিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষ পর্বে মালোদের প্রতি যখন তথাকথিত 'ভদ্রলোক'দের এই মনোভঙ্গি, তখন অদ্বৈত মল্লবর্মণের শৈশবে, গত শতাব্দীর প্রথম পর্বে তা কেমন ছিল তা সহজেই অনুমেয়। এরকম অবস্থায়

তাঁর শৈশব স্বভাবতই ছিল সংকুচিত ও বিড়ম্বিত। তাঁর এই বিব্রত ও এক ধরনের অপরাধবোধের সলজ্জ ভঙ্গিটি স্কুলজীবনে ও স্বল্পকালীন কলেজ জীবনে তাঁর সতীর্থরাও লক্ষ করেছেন। এই সমস্যাদীর্ণ অবস্থানে থেকেও শিক্ষা ও সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে উত্তরণের পথসন্ধানের ভাবনা সামাজিক তাগিদ হিসেবে অদ্বৈতের মনে গড়ে উঠেছিল।

অদ্বৈতের বাবার নাম জানা গেলেও তাঁর মায়ের নাম জানা যায় না। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, তাঁর আত্মজৈবনিক উপন্যাস 'তিতাস একটি নদীর নাম'-এ অনন্তের মাকেও ছায়াবৃতা করে রাখা হয়েছে। তার নাম জানানো হয়নি।

জীবনের কোনো পর্বেই অদ্বৈত খুব স্বস্তিতে ছিলেন না। দারিদ্র্য ও নিঃসম্বল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করেই আমৃত্যু তাঁকে বেঁচে থাকতে হয়েছে। শৈশবে তিনি একে-একে হারান তাঁর মা, বাবা ও দুই ভাইকে। তাঁরা ছিলেন তিন ভাই, এক বোন। ভাইবোনদের মধ্যে তিনি ছিলেন দ্বিতীয়। নিজেদের বাড়িতেই অগ্রজার বিয়ে হয়েছিল কিন্তু কিছুকালের মধ্যেই তিনি বিধবা হন। ১৯৩৪ সালে অদ্বৈত কলকাতায় যাওয়ার আগে তাঁর সেই বোনটিও মারা যায়। কলকাতায় থাকার সময়ে অদ্বৈত একবার তাঁর সেই দুই ভাগ্নে চিন্ত ও কাঙালী (এদের ডাক নাম) ও তাঁর খুড়তুতো ভাইয়ের ছেলে চন্দ্রকিশোরকে নবদ্বীপ নিয়ে যান। বেশ কিছুকাল আগে তাঁর ওই দুই ভাগ্নে ভরতপুরে বসবাস করত বলে জানা যায়।

মালোজীবনের এক বিরুদ্ধ ও বৈরী ভাবাপন্ন পরিবেশে অদ্বৈতের লেখাপড়া শুরু হয়েছিল। তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের প্রথম মাইনর স্কুলে ভর্তি হন। এই স্কুলটির বর্তমান নাম ব্রাহ্মণবাড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয়। মালোদের কয়েকজন পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে তাঁর লেখাপড়ার খরচ সংগ্রহ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য,

আত্মজৈবনিক উপন্যাস 'তিতাস একটি নদীর নাম'-এ অদ্বৈতের প্রতিরূপ অনন্তের মাইনর স্কুলে ভর্তি হওয়ার সম্ভাবনাটি এভাবে উল্লিখিত — গানের আসরে অনন্তর সঙ্গে পরিচিত হয়ে একজন বাউল সাধু তার সে সময়ের অভিভাবক বনমালীকে বলে, 'তোমরা যদি বাধা না দাও, চারদিকে এখন বর্ষা, জল শুকাইয়া মাঠে পথ পড়িলে তাকে আমি গোপালখালি মাইনর স্কুলে ভর্তি করাইয়া দেই। বেতন মাপ, আর আমি দশ দুয়ারে ভিক্ষা করি, কৃষ্ণের জীব, তাকেও কৃষ্ণ উপবাসী রাখিবে না।'

মালোরা যে অদ্বৈতকে চাঁদা তুলে ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরে পড়তে পাঠিয়েছিল তাতে ছিল তাদের বন্দি জীবন থেকে মুক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশা। অদ্বৈত যদি লেখাপড়া শিখতে পারে তাহলে তমসুকের খত্ বা বেপারীর হিসেব লেখাতে তাদের আর কারো পা ধরতে হবে না। বেপারীর হিসেব বা তমসুকের খত্ এমনিতেই তাদের জীবনকে পঙ্গু ও বিপন্ন করে রেখেছে। তার ওপর যদি ওই হিসেবের মধ্যেও ভুল তথ্য অথবা গোঁজামিল থাকে তাহলে তাদের বাঁচার ন্যূনতম পথও শেষ হয়ে যায়। সেজন্য অদ্বৈতর লেখাপড়া করার মধ্যে গোকর্ণের মালোরা তাদের বড় আকাঙ্ক্ষিত ন্যূনতম মুক্তির স্বপ্ন দেখেছিল। পরবর্তীকালে একই কারণে কলকাতার সীমিত রোজগার থেকে অদ্বৈত, উপেন্দ্রবাবুর স্বল্পশিক্ষিতা বিধবা প্রফুল্লকে নিয়মিত টাকা পাঠাতেন, যাতে তিনি মালোপাড়ার শিশু-কিশোরদের জন্য একটা ঘরোয়া বিদ্যালয় চালাতে পারেন। এই বালকটি যখন ধূলিধূসরিত পায়ে স্কুলে গিয়ে নির্দিষ্ট আসনে বসত তখন তার সহপাঠী বন্ধুরা না হোক, অন্তত কয়েকজন সহৃদয় শিক্ষক, ছাত্রটির মলিন মুখ দেখে তাঁরা তাতে উপোসের ছাপ দেখতে পেতেন।

এজন্য কিন্তু অদ্বৈত কখনও কোনো হীনম্মন্যতায় ভোগেননি।

দারিদ্র্যের সুযোগ গ্রহণ কিংবা তার কাছে আত্মসমর্পণ করাকে তিনি সবসময়েই ঘৃণা করতেন। তাই সতীর্থরা তাকে অভুক্ত মনে করে কিছু খাওয়াতে চাইলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তিনি অত্যন্ত নম্রভাবে তা প্রত্যাখ্যান করতেন। কখনও কখনও খেতে বাধ্য হলে মৃদু আপত্তির সঙ্গেই তা গ্রহণ করতেন। নগ্ন-পদ এই কিশোর তাঁর গ্রাম থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরে পড়তে এলেও ক্লান্তি বা অনাহারের কাছে কখনও আত্মসমর্পণ করেননি। বরং তিনি এ-সময়ে যে- অনাদর, অবহেলা ও অপমান পেয়েছিলেন তার থেকেই প্রত্যক্ষভাবে দৃঢ়-চিত্ততা ও তার পরিণতিতে নিজস্ব ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলতে পেরেছিলেন।

মাইনর স্কুলে ভর্তি হওয়ার আগেই অদ্বৈত তাঁর বাবা ও মাকে হারান। তবু তিনিই ছিলেন ক্লাসের ফার্স্ট বয়। কিন্তু তিনি ক্রমশ পরীক্ষার ফল খারাপ করতে থাকেন এবং তাঁর ওই অধোগতির প্রধান কারণ ছিল দারিদ্র্য। তাই, মাইনর পাসের সময় বৃত্তি পেলেও, ১৯৩৩ সালে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করলেও কিন্তু বৃত্তিলাভ করেননি।

অদম্য মনোবল নিয়ে অদ্বৈত কুমিল্লায় ভিক্টোরিয়া কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন—'স্কুলের শিক্ষা শেষ হইলে তাহার শুভানুধ্যায়ী, বন্ধু ও শিক্ষকেরা পুরস্কারলব্ধ ধাতুখণ্ডগুলি তাঁর বুকে আঁটিয়া দিয়া উচ্চশিক্ষার জন্য তাহাকে কুমিল্লা পাঠাইয়া দেন।'

অদ্বৈত নিতান্ত কৈশোরে জারি গানের দলের ' গানদার' বা 'খলিফা' হিসেবে সুখ্যাতি অর্জন করেন। শৈশব থেকেই তাঁর স্বাস্থ্য খুব ভালো ছিল না, কিন্তু অল্পবয়স থেকেই জ্ঞান অর্জনের স্পৃহা তাঁর মধ্যে প্রবল হয়ে ওঠে। তাছাড়া গীত রচনা ও কবিতা লেখায় তাঁর পারদর্শিতা প্রথম থেকেই লক্ষ করা যায়।

পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র থাকার সময় থেকেই অদ্বৈতর লেখালিখি

শুরু হয়। পরবর্তীকালে অন্নদা উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সময়েও তাঁর সাহিত্যচর্চা অব্যাহত থাকে। স্কুলের ছাত্র থাকার সময়েই গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধ লিখে অদ্বৈত নানা পুরস্কার পেয়েছিলেন।

ওই সময়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরে দুটি উচ্চ বিদ্যালয় ছিল — অন্নদা উচ্চ বিদ্যালয় ও জর্জ স্কুল—যেটি বর্তমানে নিয়াজি মুহাম্মদ উচ্চ বিদ্যালয় নামে পরিচিত। প্রথম স্কুলটিতে সাধারণত হিন্দু ছাত্ররা ও জর্জ স্কুলে প্রধানত মুসলমান ছাত্ররা পড়ত। মুসলমান ছাত্ররা তখন শিক্ষাদীক্ষায় অনেকটাই পিছিয়ে ছিল। তবু মুসলমান প্রধান জর্জ স্কুল থেকেই প্রথম একটি হাতে-লেখা পত্রিকা প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছিল। এর সম্পাদক ছিলেন পরবর্তীকালে অদ্বৈতরই কলেজের সতীর্থ শাহ আফতাবউদ্দীন।

সংশ্লিষ্ট দেওয়ালপত্রিকাটির নাম ছিল 'সবুজ'। ওই বিদ্যালয়ের ছাত্র মতিউল ইসলাম, মোস্তফা আলী, মমতাজউদ্দীন প্রভৃতি ছাত্ররা ছিলেন ওই পত্রিকাটির মুখ্য লেখক। তখন অন্নদা বিদ্যালয়ের ছাত্র ও স্বভাবলাজুক হওয়া সত্ত্বেও অদ্বৈতর সাহিত্যপ্রীতি ও অনুসন্ধিৎসা তাঁকেও ওই পত্রিকার সঙ্গেও যুক্ত করেছিল। তাঁর সম্পর্কে সহপাঠীরা স্বভাবতই ভেবেছিল, অদ্বৈত বোধ হয় লিখে কবিখ্যাতি লাভ করতে চায়। মুখ্যত তিনি তখন কবিতাই লিখতেন।

একজন 'গাবর'-এর লেখক হওয়ার বিষয়ে তখন তাঁর সহপাঠী ও বন্ধুদের মনে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। কিন্তু 'সবুজ'-এ যখন তাঁর লেখা কবিতা 'তিতাস' প্রকাশিত হয়, তখনকার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে শাহ আফতাবউদ্দীন বলেছেন, কবিতাটি মাইকেলের 'কপোতাক্ষ নদ'-এর আঙ্গিক ও প্রভাবের কথা মনে করিয়ে দিলেও প্রবহমান তিতাস ও তার জনপদের যে বাস্তব বর্ণনা ওই কবিতায় ছিল তাতে ওই বয়সেই ওঁর বন্ধুদের মনে হয়েছিল, 'অদ্বৈত আমাদের কবি।' ঐ লেখায় শুধু নদীর নৈসর্গিক সৌন্দর্যের কথাই